পঞ্চাশ বছর আগের এক ইঙ্গিত

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটকের ছবি নিয়ে যত হইচই হয়েছে তার একটা ভগ্নাংশও হয়নি তপন সিংহ ছবির বিচার - বিশ্লেষণে। কেন হয়নি তার প্রথম কারণ সম্ভবত এই যে, কোনও বিশেষ ভাবমূর্তি তাঁর ছবি নিয়ে গড়ে ওঠেনি। নিঃসন্দেহে তিনি প্রচুর ভালো ছবি করেছেন, কিন্তু নির্মাণরীতির দিক থেকে সে-সব ছবি নিজস্ব কোনও চলচ্চিত্রভাষা তৈরি করতে পারেনি। আপেক্ষিক যে-সব কারণে একজন শিল্পীকে কিংবদন্তি ক'রে তোলা হয় এ-দেশে, তিনি সেই কারণগুলি যে বুঝতেন না, তা নয়। তথাকথিত চলচ্চিত্র সমালোচকদের আনুকূল্য কিংবা কৃপাদৃষ্টি পেতে হলে যা যা করতে হয়, তিনি তা করেননি অত্যন্ত যত্ন সহকারেই। তারা তৈরির কারখানায় চলচ্চিত্রকার তপন সিংহের জন্ম হয়নি। তাঁর মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য এখানেই নির্জনতাপ্রিয় এই শিল্পীকে ছোট করার প্রশ্নই ওঠে না কোনও ভাবে। তাঁর ছবি যতটা মনোযোগ দিয়ে দেখা উচিত, তা হয়নি বলেই তাঁর নিজস্ব চলচ্চিত্রভাষাটি অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিপথের বাইরেই থেকে গেছে চিরকালীন অজ্ঞতায়। ব্রিটিশ আমলের মেকলের শিক্ষাব্যবস্থায় আজন্ম লালিতপালিত বাঙালি শিক্ষিত সমাজের কাছে এর বেশি কিছু আশা করাও ঠিক নয়। যথাযথ চিন্তাধারা ও স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয় না এই শিক্ষাব্যস্থায়। যাঁদের হয় তাঁরা ব্যতিক্রম ছাড়া কিছু নয়।

আর তাই মফস্বল শহর বালির সিনে গিল্ড-এর পত্রিকা 'প্রসঙ্গ চলচ্চিত্র' -এর পঞ্চদশ সংখ্যায় এই প্রশ্নটিই পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল দায়িত্বশীল পাঠকদের কাছে। ২০০৪-এর ১৯ মার্চ প্রকাশিত এই সংখ্যার 'কথামুখ' অংশে বলা হয়েছে,

> যে প্রশ্নটা নিয়ে এই সংখ্যার ভাবনা আসে, তা কিন্তু এখনও উত্তরের অপেক্ষায়। কেন তপন সিংহ সংস্কৃতির পীঠভূমি কোলকাতার সংস্কৃতি মহলে ব্রাত্য হয়ে গেলেন। কেন তাঁকে মূল্যায়নের কোন সার্থক প্রয়াস হয়ে উঠল না, কেনই বা তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রগুলির শুধুই কিছু ত্রুটি নির্দেশ করে আমরা সবাই পরম বোদ্ধা সেজে বসে থাকলাম— তা আমাদের জানা নেই। এ সব কেন-র জন্য আমরাও দায়ী।...কাহিয়ের দ্যু সিনেমা ও আভা গাঁর্দের ফ্রাঁসোয়া ক্রুফোই তো হিচককে যথাযথ ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর স্বক্ষেত্রে। এখানে ক্রুফো নেই। তপন সিংহও হয়ত হিচকক নন। তবু যদি মানুষ তপন সিংহ, চলচ্চিত্রকার তপন সিংহকে নিয়ে আর একটু আলোচনা হয়, তাঁর ছবিগুলি নিয়ে নতুন করে ভাবনা শুরু হয় তবে বোধহয় ভাল হয়। এই সংখ্যা সেই 'বোধ হওয়া'র ক্ষেত্রে এক পদক্ষেপ মাত্র— অন্তত সেই লক্ষেই আমরা এগোতে চেয়েছি।

প্রসঙ্গ চলচ্চিত্রের তপন সিংহ সংখ্যাটি প্রকাশের আগে তপন সিংহকে নিয়ে দু'টি বই এবং নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির পত্রিকা 'চিত্রভাষ' প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর তপন সিংহকে নিয়েই আবার প্রকাশিত হল 'সমাকল্য।'

মাটির গভীরে বীজ যেমন আত্মগোপন করে থাকে সঠিক সময়ে আলো হাওয়ার ডালপালা নিয়ে নিজেকে মেলে ধরার জন্য, এই পত্রিকাগুলির তপন সিংহ সংখ্যা প্রকাশ সেরকমই এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। লিটিল ম্যাগাজিন তার দায়িত্ব পালন করছে, তাদের নানা কৌশলে এখনও মেরে ফেলা যায়নি কিংবা তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি, এই ঘটনাই তার প্রমাণ। তপন সিংহর প্রথম ছবি 'অঙ্কুশ'ও প্রযোজনা করেছিল লিট্‌ল পিকচার্স। প্রযোজকের নাম সংগ্রহ করতে পারিনি, কিন্তু লিট্‌ল যে কোনও অর্থেই লিট্‌ল নয়, বুঝতে অসুবিধা হয় না। লিট্‌ল ম্যাগাজিন ও লিট্‌ল পিকচার্স— কোথায় যেন একটা আত্মিক মিল খুঁজে পাই।

১৯মার্চ, ১৯৫৪ মুক্তি পেয়েছিল 'অঙ্কুশ'। সাদা কালো এই ছবির গল্প নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। প্রথম ছবি থেকেই প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের কাহিনি নিয়ে ছবি করার প্রবণতা দেখা গেছে তপন সিংহর। তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'উপহার' -এর কাহিনি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের। ১৯৫৫-র ১২ আগস্ট মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবির পর তপন সিংহ করেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'টনসিল'। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫৬-র ৯ মার্চ। রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে তাঁর পরের ছবি 'কাবুলিওয়ালা'। রবীন্দ্রনাথের অতি বিখ্যাত এই ছোটগল্পটি নিয়ে তিনি এগারো রিল-এর ছবি করেন। অত্যন্ত মানবিক এই গল্পটি চলচ্চিত্র পরিচালক তপন সিংহকে ভারতের অন্যতম প্রধান চলচ্চিত্রকারের মর্যাদা দেয়। 'কাবুলিওয়ালা'-র মতো ছোটগল্পকে যে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রে পরিণত করা যায় এবং তার জন্য যে দক্ষতা ও কল্পনার প্রয়োজন হয়, তার পুরো পরিচয় রেখেছিলেন তপন সিংহ এই ছবিতে।

এখান থেকেই তপন সিংহকে হয়তো ভুল বোঝার শুরু হয়। কেউ কেউ মনে করেন, লিখিত সাহিত্যের সেলুলয়েড ভাষ্যই তপন সিংহর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাহিত্য ও চলচ্চিত্র এক কথা নয়। চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা আছে। নিছক কাহিনি উপস্থাপনাই তার মূল উপজীব্য হতে পারে না। তপন সিংহ কাহিনির প্রতিই মোটামুটি অনুগত থেকেছেন আগাগোড়া। চলচ্চিত্রে গল্পের উপাদানকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি নিজেও লিখেছেন 'ক্ষণিকের অতিথি'। নির্মল কুমার সেনগুপ্ত ছদ্মনামে এই গল্পের কাহিনি লেখেন তপন সিংহ নিজে। পরের ছবি রবীন্দ্রনাথের

আর এক বিখ্যাত গল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ'। 'ঝিন্দের বন্দী'র লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' তৈরি হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস নিয়ে। 'জতুগৃহ'-র গল্প সুবোধ ঘোষের। বনফুলের গল্প 'আরোহী' ও 'হাটে বাজারে'। তিনি নিজের লেখা নিয়েও ছবি করেছেন সময় ও সুযোগ পেলে। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' নিয়ে ছবি করার পরই (১৯৬৫-র ৪ জুন মুক্তিপ্রাপ্ত) তিনি করেন 'গল্প হলেও সত্যি'। এই ছবির কাহিনি, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত তাঁর নিজের। সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে তাঁর ছবিতে যুক্ত হয়েছেন কালীপদ সেন (অঙ্কুশ, উপহার), শৈলেন রায় (টনসিল), রবিশঙ্কর (কাবুলিওয়ালা), পঙ্কজকুমার মল্লিক (জরাসন্ধের 'লৌহকপাট'), হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (ক্ষণিকের অতিথি), আলি আকবর খাঁ (ক্ষুধিত পাষাণ, ঝিন্দের বন্দী), আশীষ খাঁ (জতুগৃহ) ও শচীন দেব বর্মন ('জিন্দেগি জিন্দেগি'—ক্ষণিকের অতিথির হিন্দি ভাষ্য এবং সাগিনা মাহাতোর হিন্দি)। তবে তপন সিংহ নিজেই তাঁর বহু ছবির সঙ্গীত পরিচালক। যেমন অতিথি, গল্প হলেও সত্যি, হাটে বাজারে, আপনজন, সাগিনা মাহাতো, এখনই, আঁধার পেরিয়ে, রাজা, হারমোনিয়াম (কাহিনি ও চিত্রনাট্য তাঁর নিজের), এক যে ছিল দেশ, সবুজ দ্বীপের রাজা, বাঞ্ছারামের বাগান (কাহিনি মনোজ মিত্র), আদালত ও একটি মেয়ে, বৈদূর্য রহস্য (কাহিনি, চিত্রনাট্য ও গীত রচনাও তাঁর নিজের), আতঙ্ক (কাহিনি, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত তাঁর রচনা), অন্তর্ধান, হুইল চেয়ার (কাহিনি, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত তাঁর নিজের), এবং আজব গাঁয়ের আজব কথা। হিন্দিতেও তিনি কিছু ছবি করেছেন। এগুলির মধ্যে 'আজ কা রবিনহুড'-এর কাহিনি, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত তাঁর নিজের। 'এক ডক্টর কি মত' -এর সঙ্গীত পরিচালক তিনি নিজে। 'আনোখা মোতি'র কাহিনি ও চিত্রনাট্য লেখা পাশাপশি এই ছবির সঙ্গীতও তিনি পরিচালনা করেন। হিন্দি ছবিতে সুর দেওয়ার সময়ও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ। তিনি সম্পূর্ণ শিল্পী। কাহিনি রচনা এবং সেই কাহিনিকে চিত্রনাট্যে রূপ দিয়ে তিনি যে প্রতিভা ও দক্ষতা দেখিয়েছেন তারই আর এক প্রকাশ ঘটেছে সঙ্গীত সৃষ্টিতে। তপন সিংহর প্রতিভার মূল্যায়নে আমরা ইচ্ছা করেই উপেক্ষা ও অবহেলার পরিচয় দিয়েছি যুগ যুগ ধরে। এটা যেমন আমাদের সুশিক্ষার অভাব, তেমনই ঘাটতি সদিচ্ছার। এর নেপথ্যেও গূঢ় উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তপন সিংহ নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। আখের গুছনোর জন্য বিশেষ বিশেষ মহলে জনসংযোগের প্রয়োজন অনুভব করেননি কখনও। বিদেশেও যে খুব একটা স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন, এমন মনে করার কারণ ঘটেনি। পুরস্কার, ছবির প্রদর্শনী ইত্যাদি বিষয়েও বিদেশে নানা অঙ্ক কাজ করে। ধোয়া তুলসিপাতা নয় তারা।

বাংলায় নৈরাজ্য, অত্যাচার, অনাচার ও সন্ত্রাস নিয়ে শেষ দিকে কয়েকটি ছবি করেন তপন সিংহ। শাসককুল নিশ্চয় এটা ভালো চোখে দেখেনি। তাঁর যোগ্য প্রতিভার স্বীকৃতি না দিয়ে কিংবা আংশিক দিয়ে তার নিজেদের স্বভাব চরিত্রটিই স্পষ্ট করে দিয়েছেন চিন্তাশীল মানুষদের কাছে। 'অঙ্কুশ' ছবির শুভমুক্তির বিজ্ঞাপনে তপন সিংহর ছবিটি সম্পর্কে বলা হয়েছিল 'ভাবীকালের সমাজের শুভ ইঙ্গিত বহন ক'রে আনছে...'। সেই ইঙ্গিত আর বাস্তবে রূপায়িত হল না আজকের অপশাসিত পশ্চিমবঙ্গে। তিনি অন্তত দেখে গেলেন না। না হলে 'হুইল চেয়ার', 'আতঙ্ক' কিংবা 'এক ডক্টর কি মত' -এর মতো ছবি করতেন না পর পর। ছলনা, গোপন লেনদেন, বোঝাপড়া, আপস, মিথ্যাচার ও নিষ্ঠুরতার দৈনন্দিন জীবনের বাইরে তপন সিংহ নিজের মহিমাতেই থাকবেন অমলিন। মানুষ তপন সিংহ ও চলচ্চিত্রকার তপন সিংহর মধ্যে কোনও ফারাক নেই। সৎ মানুষ তিনি, শিল্পেও সৎ। খুব কম শিল্পীর ক্ষেত্রেই এ-কথা বলা যায়।

সংবেদনশীল শিল্পী, মানুষ বাইরের অত্যাচার ও অনাচারের কষ্ট পান। আলিপুরের নির্জন ফ্ল্যাটে জীবনের শেষ কয়েকটি দিন কাটাতে কাটাতে সেই কষ্টই পেয়েছিলেন তপন সিংহ। নিজের অনেক ছবিতে, বিশেষ করে শেষ দিককার ছবিতে সেই কষ্টের কথা বলা হয়েছে সহজ সরল ভাষায়। শিল্পের জটিল কৌশল এ-সব ছবিতে নেই। মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা বলতে গিয়ে, ছায়াছবির পর্দায় তা জলজ্যান্ত মূর্ত করার মুহূর্তগুলিতে শিল্পের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে শিল্পীর মায়া-মমতা। তপন সিংহ তাঁর ছবিতে সৎ শিল্পীর চেতনাকেই অনুসরণ করেছেন বারবার।

তপন সিংহ জন্মেছিলেন বীরভূম জেলার প্রত্যন্ত এক গ্রামে। মুর্শিদাবাদ সীমান্তে ওই গ্রামের নাম হিলোরা। এই গ্রামেই আছেন শ্যামচাঁদ। শ্যামচাঁদের বিগ্রহ ঘুরে ফিরে নানা গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। মেলা বসে। এক এক গ্রামে মাসাধিক কাল চলে ওই মেলা। তারপর শ্যামচাঁদ আবার ফিরে যান হিলোরা গ্রামে নিজের বাড়িতে। আমি হিলোরা গেছি। শ্যামচাঁদের মেলায় গেছি নানা গ্রামে। হিলোরার পাশে যাজিগ্রামে গেছি গান্ধী আশ্রমে। আবিষ্কার করেছি টেরাকোটার অসাধারণ নাটমন্দির। এসব আমাদের কৈশোরের কথা। সংসারের প্রান্ত জানলায় বসে এখন ভাবছি, আবার এই এতদিন পরে হিলোরা যাব। শ্যামচাঁদকে দেখে আসব। আর দেখে আসব তপন সিংহের ফেলে আসা বাড়ি। কী দেখব জানি না, কিন্তু যেতে হবেই।